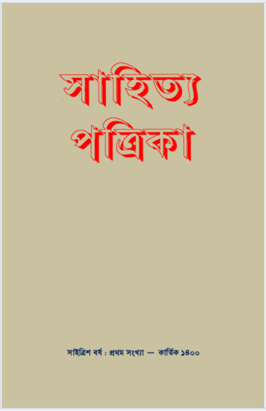

Vol. 37 | No. 1 | 1993

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলা বৃক্ষনাম এবং প্রাণীনামে বৈচিত্র্য

Volume	37
Issue	1
Year	1993
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	অনিমেষকান্তি পাল
Published online	October 1, 1993
DOI	10.62328/sp.v37i1.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v37i1.3
Pages	53-83
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সাহিত্য পত্রিকা
বর্ষ ৩৭ : সংখ্যা ১

Check for updates

বাংলা বৃক্ষনাম এবং প্রাণীনামে বৈচিত্র্য

অনিমেষকান্তি পাল*

বাংলায় বৃক্ষনাম ও প্রাণীনামের যে বৈচিত্র্য, তা অনেক পরিমাণে বিশেষ নৃগোষ্ঠী ও তাদের ভাষাগুলির প্রভাবজাত। এই বৈচিত্র্যের মধ্যে রয়েছে ধ্বনিতাত্ত্বিক, আঞ্চলিক ও সাংস্কৃতিক পার্থক্য। বৃক্ষনাম ও প্রাণীনামের এই বৈচিত্র্যের সঙ্গে আবার যোগ রয়েছে গালি/নিন্দার্থে, যৌনতা এবং লোকবিশ্বাস ও সংস্কারের। এভাবে গালির অথবা যৌনতা প্রকাশের পটভূমিতে রয়েছে অবদমনের প্রবণতার প্রতিক্রিয়া, লংঘন-ইচ্ছা, প্রতীকতা, সাংস্কৃতিক ও আঞ্চলিক অভিজ্ঞতা ইত্যাদি। লৌকিক স্মৃতি ও সংস্কার বিলুপ্ত হওয়ার আগেই এর একটি পরিপূর্ণ পর্যবেক্ষণের উপাত্ত সংগ্রহ করা জরুরী।

* অধ্যাপক, মেদিনীপুর সরকারী কলেজ ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।

বাংলা বৃক্ষনাম ও প্রাণীনাম নিয়ে কি রকমের আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধে অভিপ্রেত তার একটি পূর্বাভাস দেওয়ার জন্যে প্রথমেই একটি ছক তুলে ধরা যেতে পারে। তারপর সেই ছক অনুযায়ী আলোচনাটিকে এগিয়ে নিয়ে গেলে পাঠকের পক্ষে সমস্ত বিষয়টি সহজে অনুধাবন করার সুবিধে হবে বলে মনে হয়।

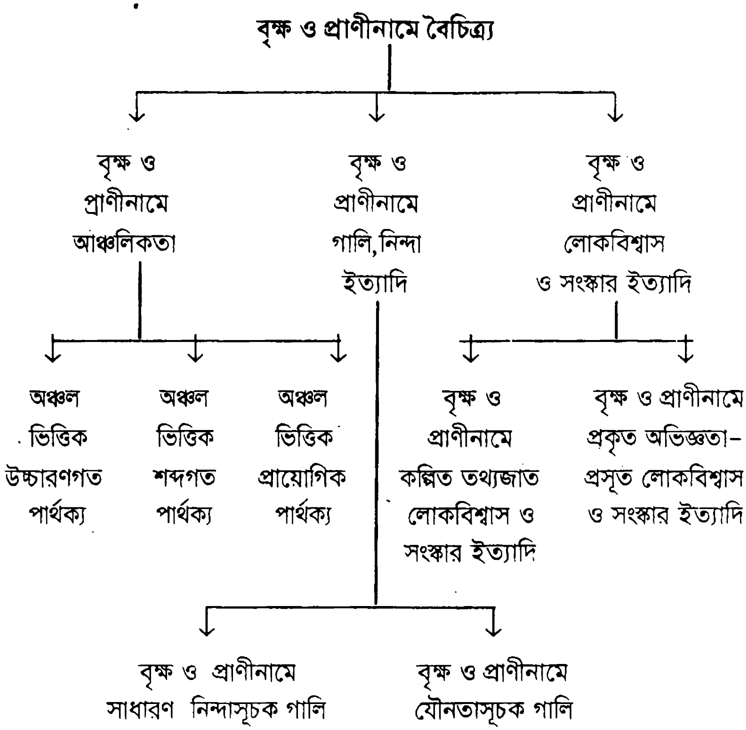

এক এক ভাষায় এক এক গাছের এক এক নাম। প্রাণীদের বেলাতেও তাই। আবার বাংলা ভাষায় দেখা যাচ্ছে–ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে একই গাছের এবং একই প্রাণীর ভিন্ন ভিন্ন নাম। অর্থাৎ বলা যেতে পারে, বৃক্ষ ও প্রাণীনামেরও ভূগোল বিবরণ তৈরি করা সম্ভব। যেমন পূর্ববাংলায়–'কুমড়া', কলকাতায়–'কুমড়ো', পূর্ব–দক্ষিণ মেদিনীপুরে–'বৈতাল', বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর ও পুরুলিয়ায়–'ডিংলা'। এতো গেল গাছের কথা। প্রাণীর বেলাতেও এমন উদাহরণ অনেক পাওয়া যাবে। অনেকে মনে করেন– নামের ব্যাপারে এই যে সব পার্থক্য–এতে প্রভাব পড়েছে বিশেষ বিশেষ নৃগোষ্ঠীর ও তাদের বিশিষ্ট ভাষাগুলির।

প্রথমে গাছপালার কথাই আলোচনা করা যাক। গাছপালার ক্ষেত্রে নামে যে পরিবর্তন দেখা যায়, তা শুদ্ধ ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তন হতে পারে, যেমন– পূর্ব বাংলার ঢাকায় বলা হয় 'লেমু', পশ্চিমবাংলায় চলিত ভাষায় 'লেবু'। আর হুগলী অঞ্চলের উপভাষায় 'নেবু'। চলিত ভাষায় 'লাউ' আর হুগলীতে 'নাউ' চলিত ভাষায় 'লঙ্কা', হুগলীতে 'নঙ্কা'। ধ্বনিগত পরিবর্তনকে সূত্রাকারে বেঁধে দেওয়া যায় এবং অল্প একটু ব্যাখ্যার দ্বারাই তাকে সহজবোধ্য করে তোলা যায়। কিন্তু যেখানে এক শব্দের বদলে আর এক শব্দ এসে যাচ্ছে সেখানে পার্থক্যটির উৎস সাংস্কৃতিক ও নৃগোষ্ঠীগত। একটা উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটাকে স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেওয়া যেতে পারে–পূর্ব বাংলায় ঢাকায় বলা হয়– 'উক',চলিত ভাষায় 'আখ', ময়মনসিংহে 'আউখ'। কিন্তু পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের কোথাও এস্থলে 'কুশাইর' শব্দটি ব্যবহৃত হতে শোনা যায়। উক–আউখ–আখ ঃ একটি শব্দই ধ্বনি পরিবর্তনের ফলে তিনরূপ ধারণ করেছে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু স্পষ্টত, 'কুশাইর' শব্দটি অন্য কোনো উৎস থেকে এসেছে।

দেখা যাক কোন কোন গাছের নাম তুচ্ছার্থে, নিন্দার্থে কিংবা গালি হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই বিষয়টি নানা দিক থেকেই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেওয়া যেতে পারে। 'পশ্চিমবঙ্গে কোনো ব্যক্তিকে যদি বলা হয়–'তুমি একটি ঢ্যাঁড়শ' –তবে সে এটাকে গালি অর্থেই নেবে বটে কিন্তু খুব একটা খারাপ গালি মনে করবে না। কারণ কলকাতার কথ্য ভাষায় 'ঢ্যাঁড়শ' শব্দটির বিশিষ্ট অর্থ হল অকর্মা বা অপদার্থ। এরকম আরো অনেক বৃক্ষনাম আছে যা গালি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন– 'কুমড়ো' শব্দটির গালি হিসেবে বিশিষ্ট অর্থ হল– মোটা এবং অকর্মা। 'মাকাল' শব্দটির বিশিষ্ট অর্থ হল সুদর্শন কিন্তু নির্গুণ মানে দেখতে ভাল কিন্তু কোনো কাজের নয়। ঠিক এই একই অর্থে 'রাঙ্গামূলো' শব্দটিও ব্যবহৃত হয়।

কতকগুলি বৃক্ষনাম আবার গালি হিসেবেও বিশেষ ইঙ্গিতবাহী। ইঙ্গিতগুলি যৌনতাসূচক এবং নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সাধরণ অশ্লীল বলেই গণ্য হয়ে থাকে। কিন্তু তাহলেও এগুলির নানারকম তাৎপর্য আছে–মনস্তত্ত্ব, সমাজ বিজ্ঞান এবং সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের বিশেষ বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে। অতি প্রাচীন, নানা আদিম বিশ্বাস, সংস্কার এবং নানারকমের অস্বাভাবিক যৌনাচারের লুপ্তস্মৃতির টুকরো–টাকরা গালি হিসাবে ব্যবহৃত এই সব বৃক্ষনামে ফসিলের মত যেন ধরা আছে বলে মনে হয়।[১]

বৃক্ষনাম ও প্রাণীনামের দ্বারা গালি কিংবা নিন্দার বিষয়টির মূলে আছে inhibition বা অবদমনের বিপরীতমুখী প্রবণতা, যাকে বলা যায় urge for

violation বা লঙ্ঘনেচ্ছা। মৃদু নিন্দাসূচক গালিশব্দ হিসাবে বৃক্ষনাম ও প্রাণীনাম ব্যবহারের মধ্যে লঙ্ঘনেচ্ছাটি প্রচ্ছন্ন, যেন একটু সমালোচনা করার বা অল্প একটু তামাশা করার ইচ্ছা মাত্র। কিন্তু যৌনতাসূচক গালি শব্দ হিসেবে বৃক্ষনাম ও প্রাণীনাম ব্যবহারের মধ্যে লঙ্ঘনেচ্ছাটি অতি প্রবল হলেও তা কিছুটা আবৃত। আবরণ সৃষ্টির জন্যই প্রতীকের আশ্রয় নিতে হয়। বৃক্ষনাম ও প্রাণীনাম আসলে এক্ষেত্রে নানা গূঢ় ইচ্ছার, অবচেতন ইচ্ছার প্রতীকী আবরণ মাত্র। আবরণটি দ্বিস্তরীয়। গালি ব্যাপারটাই হচ্ছে ঘাতেচ্ছা, হননেচ্ছা, ধর্ষণেচ্ছার expression by substitution অর্থাৎ বৈকল্পিক প্রকাশ। এটা deeper stratum বা গভীরতর স্তরের ব্যাপার। তারপর আসছে গালির বদলে বৃক্ষনাম ও প্রাণীনামের ব্যবহার। একে বলা যায় upper stratum বা উপরের স্তরের ব্যাপার যা কিনা স্পষ্টত প্রতীকাশ্রয়ী; প্রতীক ব্যবহারের দ্বারা আড়াল সৃষ্টির চেষ্টা মাত্র। নিম্নলিখিত শব্দগুলির এই জাতীয় বিশিষ্টার্থক প্রয়োগ লক্ষ্য করার মত :

কলা, কচু, আমড়া, আলু, বাঁশ ইত্যাদি।

যে ছকটি এই আলোচনার প্রথমেই তুলে ধরা হয়েছে সেটি এখন আরেকবার দেখে নিলে ভাল হয়। প্রথম বিভাগে ধরা হয়েছে বৃক্ষনাম ও প্রাণীনামে আঞ্চলিকতার বিষয়টিকে। দ্বিতীয় বিভাগে–বৃক্ষনাম ও প্রাণীনামে গালি, নিন্দা ইত্যাদি স্থান পেয়েছে। দ্বিতীয় বিভাগটি উদাহরণসহ এবং উদাহরণবর্জিত–দুই ভাবেই উপস্থিত করা হয়েছে। তৃতীয় বিভাগে প্রবেশ করার আগে আঞ্চলিকতার একটু মূলান্বেষণ প্রয়োজন। আসলে, অঞ্চলের কোনো বিশেষ নৃগোষ্ঠীর প্রাচীন বা আদিম ভাষা অভ্যাস সেই বিশেষ অঞ্চলের মানুষদের মধ্যে বর্তমান। ভারতে এবং বাংলাভাষাভাষী অঞ্চলে সাধারণভাবে এই পরিস্থিতি প্রায় সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু অস্ট্রিক, দ্রাবিড় কিংবা তিব্বতীবর্মী–এই তিনগোষ্ঠীর ভাষাগুলির মধ্যে কোনটির প্রভাবে কোন শব্দের ক্ষেত্রে কোন আঞ্চলিক পার্থক্যটি ঘটে যাচ্ছে তা বলা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এখনো বেশ কঠিন। কারণ এখনো এ বিষয়ে মৌলিক গবেষণা অপ্রতুল।

এবারে আসা যাক তৃতীয় বিভাগের আলোচনায়– বৃক্ষনামের সঙ্গে জড়িত নানা লোকবিশ্বাস এবং সংস্কারের প্রসঙ্গটিতে। এক্ষেত্রে দুটি আলাদা শ্রেণী লক্ষ্য করা যেতে পারে। এক –প্রকৃত অভিজ্ঞতাপ্রসূত তথ্য থেকে উদ্ভূত লোকবিশ্বাস এবং সংস্কার; আরেক–কল্পিত ধারণাজাত লোকবিশ্বাস এবং সংস্কার। যেহেতু বর্তমান আলোচনার ক্ষেত্রটি হল বৃক্ষনাম ও প্রাণীনামবাচক শব্দসমূহের প্রায়োগিক বিশিষ্টতার বিচার মাত্র, সেই হেতু সাধারণভাবে সংস্কার ও লোকবিশ্বাসের ব্যাপক ক্ষেত্রটিতে প্রবেশ করার কথা ওঠে না। তাই বর্তমান আলোচনা কেবল শব্দবিচারেই সীমাবদ্ধ রাখা হবে। যে

সব বিশিষ্ট প্রয়োগে এই জাতীয় লোকবিশ্বাস ও সংস্কার কিছুটা সুসংহত রূপ লাভ করেছে সেগুলিকে একটা শৃঙ্খলার মধ্যে নিয়ে আসার চেষ্টা করা যেতে পারে।

প্রকৃত অভিজ্ঞতাপ্রসূত তথ্যবাহী বিশিষ্ট প্রয়োগে বৃক্ষনাম

এঁচড় : এঁচড়ে পাকা।

ওল, তেঁতুল : যেমন বুনোওল তেমনি বাঘা তেঁতুল।

কচু : (ক) কচু কাটা ;
(খ) কচু (গাছ)।

কলা : সর্বঘটে কাঁঠালী কলা।

তেঁতুল : যদি হয় সুজন, তেঁতুল পাতায় নজন।

নিম, নিশুন্দে, মাকাল : নিম তেতো, নিশুন্দে তেতো, তেতো মাকালফল ;
তাহার অধিক তেতো কন্যে বোন সতীনের ঘর।

পাট (পাঠকাঠি–প্যাঁকাটি) : প্যাঁকটির মত (সরু, রোগা)।

বাঁশ : (ক) বাঁশবন ডোম কানা ;
(খ) বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়।

লঙ্কা : ধানি লঙ্কার তেজ।

লাউ : ঝোলের লাউ অম্বলের কদু।

লেবু : লেবু কচলানো।

সরষে : চোখে সরষে ফুল দেখা।

কল্পিত ধারণাজাত বিশিষ্ট প্রয়োগে বৃক্ষনাম

কাঁঠাল : (ক) কাঁঠালের আমসত্ব ;
(খ) গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল।

খেজুর : (ক) খেজুরে আলাপ ;
(খ) গোঁফ খেজুরে।

তুলসি : তুলসি বনের বাঘ।

পটল ঃ পটল তোলা।

পিঁয়াজ ঃ পিঁয়াজি মারা।

বেল ঃ ন্যাড়া বেলতলায় যায় না।

ভ্যারেণ্ডা ঃ ভ্যারেণ্ডা ভাজা।

হলুদ ঃ গায়ে হলুদ।

সরষে ঃ সরষের মধ্যে ভূত।

সন্দেহ নেই যে, বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের গ্রাম-গ্রামান্তরে ধৈর্যের সঙ্গে অনুসন্ধান চালিয়ে গেলে, এই রকম বৃক্ষনামের সঙ্গে জড়িত বহু সংখ্যক বিশিষ্ট প্রয়োগ খুবই সহজে সংগ্রহ করা সম্ভব হবে। এই সব বিশিষ্ট প্রয়োগের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করলে গাছপালার সঙ্গে সাধারণ লোকমানসের বিচিত্র সম্পর্কটি ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

প্রাণীনামেও অঞ্চলভিত্তিক উচ্চারণগত পার্থক্য এবং অঞ্চলভিত্তিক শব্দগত পার্থক্য দেখা যায়। যেমন কলকাতায়- 'মোশ', ঢাকায়-'মইশ্', পশ্চিম মালদহে-'ভঁইস', মুর্শিদাবাদের পশ্চিমাঞ্চলে- 'মহিষ',-ইত্যাদি। কলকাতায় -'শেয়াল', হাওড়ায়- 'শ্যাল', মুর্শিদাবাদের পশ্চিমাঞ্চলে- 'শিয়ার', ঢাকায়-'হিয়াল', রাণীগঞ্জ- আসানসোল অঞ্চলে 'সিয়াড়',-ইত্যাদি। এগুলি স্পষ্টতই একই শব্দের ধ্বনিগত পরিবর্তনের ব্যাপার যা সুত্রাকারে বর্ণনা করা সম্ভব এবং আগে থেকেই ব্যাখ্যা করে রাখা সম্ভব।

একই প্রাণীর অঞ্চলবিশেষে ভিন্ন ভিন্ন নাম যে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা-সাংস্কৃতিক উৎস থেকে আগত তা কখনো কখনো স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেওয়া সম্ভব হতে পারে। যেমন 'মোশ্' অর্থে 'কাডা' বা 'কারা' বা 'কাড়া' বা 'কারাহা' শব্দটি অস্ট্রিকগোষ্ঠীরই কোনো একটি ভাষা থেকে এসেছে পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়া অঞ্চলের বাংলা উপভাষায়- একথা প্রায় সুনিশ্চিতভাবেই বলা যেতে পারে। তেমনি বলা যেতে পারে মেদিনীপুর জেলার বীণপুর থানা অঞ্চলের বাংলা উপভাষায় পাঁঠা অর্থে ব্যবহৃত 'ম্যারম্' শব্দটির কথা যা কিনা সুনিশ্চিতভাবেই অস্ট্রিক গোষ্ঠীরই কোনো একটি ভাষা থেকে এসেছে। কারণ 'কাডা' এবং 'ম্যারম' শব্দদুটি সাঁওতালী ভাষাতেও পাওয়া যায়।

ধরা যাক, অন্য কতকগুলি প্রাণীনামের কথা। দেখা যাবে যে বহুক্ষেত্রেই কোন নামটি কোন উৎস থেকে এসেছে তা নির্দেশ করা আপাতত সম্ভব হচ্ছে না, কাজেই

আপাতত এগুলিকে বলতে হবে অজ্ঞাতমূল শব্দ যা কোন ভাষা বা কোন সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল থেকে এসেছে তা জানা সম্ভব হয়নি। যেমন- কলকাতায় 'ছারপোকা', ঢাকায়- 'উলুশ', কাঁথি অঞ্চলে -'উরুশ'। 'উলুশ' বা 'উরুশ' শব্দটিকে এখন আমাদের অজ্ঞাতমূল বলেই ধরে নিতে হবে। কলকাতায়-'খরগোশ্', ঢাকায়- 'ফইট্টা', বাঁকুড়ায়- 'শশা', নদীয়ার কোথাও 'খরা' আবার কোথাও 'গোড়া' শব্দটি শোনা যায়। স্পষ্টত, 'শশা' শব্দটি এসেছে সংস্কৃত 'শশক' শব্দ থেকে। কিন্তু স্বীকার করতেই হবে যে 'ফইট্টা' শব্দটি অজ্ঞাতমূল। কলকাতায় -'পাঁঠা', বীণপুরে- 'ম্যারম', কিন্তু দার্জিলিং এ 'বোকা'। 'বোকা' শব্দটি ছাগল অর্থে নেপালী ভাষায় প্রচলিত আছে। কলকাতায় প্রচলিত- 'কচ্ছপ' শব্দটির ঢাকাই প্রতিশব্দ- 'কাউট্টা'। 'কচ্ছপ' শব্দটির মূলে সংস্কৃত 'কশ্যাপ' শব্দটি থাকতেও পারে, কিন্তু 'কাউট্টা' শব্দটি কোন উৎস থেকে এসেছে তা বলা মুশকিল। কলকাতায়-'বিড়াল বা বেড়াল', ঢাকায়-'বিলাই', মেদিনীপুরের কোথাও কোথাও' 'বিলই', কিন্তু ঢাকা জেলাতেই কোথাও কোথাও 'মেকুর (মেহুর)' শব্দটির ব্যবহারও শোনা যায়। এই ' মেকুর বা মেহুর' শব্দটি কোন উৎস থেকে এসেছে তা বলা যায় না।

যে সব প্রাণীনাম গালি শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয় সেগুলির মধ্যে গৃহপালিত প্রাণীদের নামই বেশি শোনা যায়। গালি অর্থে প্রযুক্ত প্রাণীমগুলির মধ্যে প্রথমে আসা যাক সেই নামগুলির কথায় যেগুলি মৃদু নিন্দাসূচক গালি অর্থে ব্যবহৃত। ধরা যাক 'গর্ধভ' বা 'গাধা' শব্দটির কথা। এই শব্দটি গালি হিসেবে মূর্খ অর্থে বহুব্যবহৃত। তেমনি গালি হিসেবে মূর্খ অর্থে বহু ব্যবহৃত 'বোকা' শব্দটির আসল অর্থ যে 'পাঁঠা' তা দার্জিলিং ছাড়া বাংলাদেশের অন্যত্র খুব কম লোকেই জানে। 'বোকা' শব্দটি সাধারণভাবে বাংলা ভাষায় মূর্খ শব্দের প্রতিশব্দ মাত্র। একত্রে 'বোকা- পাঁঠা' শব্দযুগলও ব্যবহৃত হয় গালি হিসেবে অত্যন্ত বেশি রকমের মুর্খ বোঝানোর জন্যে। আর 'পাঁঠা' এবং 'ছাগল' শব্দও আলাদা আলাদাভাবে মৃদু গালি হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে- মূর্খ, কাণ্ডজ্ঞানহীন, হিতাহিত বোধশূন্য- ইত্যাদি বোঝানোর জন্য।

'শুওর' শব্দটি গালি হিসেবে বোঝায়- ন্যায়-অন্যায় বোধহীন, একগু'য়ে, নোংরা, ঘৃণ্য-ইত্যাদি। এই শব্দটি বাংলা ভাষার একটি অতি সাধারণ গালি শব্দ। তবে এটি পূর্ববঙ্গের উপভাষাতেই গালি হিসেবে বেশি ব্যবহৃত হয়। 'উল্লুক' শব্দটি গালি হিসেবে বোঝায় কাণ্ডজ্ঞানহীন, মূর্খ- ইত্যাদি পূর্ব, পশ্চিম, দুই বাংলাতেই। হিন্দিতেও গালি হিসেবে শব্দটিকে পাওয়া যায় 'উল্লু' রূপে। হিন্দিতে এর সাধারণ অর্থ- পেঁচা। সংস্কৃত ভাষায় এবং মধ্যযুগীয় বাংলা ভাষায় 'উলূক' অর্থ -পেঁচা। ধরে নেওয়া যেতে পারে যে বাংলা 'উল্লুক' এবং হিন্দি 'উল্লু' এসেছে সংস্কৃত 'উলূক' শব্দ

থেকে। ঢাকা অঞ্চলের বাংলা উপভাষায় 'বিলাই' এবং 'মেকুর/মেহুর' শব্দ গালি হিসেবে ব্যবহৃত হয় নির্বোধ অর্থে।

তবে 'ষাড়' শব্দটিকে গালি হিসেবে প্রয়োগ করা হয় বিশালদেহী পুরুষ মানুষের প্রতি। এই শব্দটি গালি হিসেবে বোঝায়– একগুঁয়ে, নির্বোধ, আশেপাশের প্রাণী এবং বস্তু সম্বন্ধে অচেতন, অকারণে গায়ের জোর প্রয়োগে উৎসুক,–ইত্যাদি। তাছাড়া জোরে চীৎকার করে এমন লোককেও (তা সে একটি ছোট শিশু হলেও) ষাঁড় বলে গালি দেওয়া হয়। মৃদু নিন্দার্থে প্রযুক্ত হয় আরো কিছু কিছু প্রাণীনাম। যেমন 'হাতি' শব্দটি গালি হিসেবে প্রয়োগ করা হয়– মোটা–সোটা, নাদুস–নুদুস মানুষের প্রতি। 'ভেড়া' শব্দটি গালি হিসেবে বোঝায় নেতার মুখাপেক্ষী ভীরু স্বভাবেরর মানুষকে। 'শেয়াল' শব্দটি গালি হিসেবে ধূর্ত, ফন্দিবাজ–ইত্যাদি। 'বাঁদর' অর্থ–অকারণে ছোটখাট উৎপাতকারী। তবে ছোট ছেলেমেয়েদের প্রতি, বড়রা স্নেহে এবং ক্রোধে 'বাঁদর' শব্দটি ব্যবহার করেন। পূর্ব বাংলায় এক্ষেত্রে বলা হয় 'বান্দর'। পূর্ব বাংলায় 'ব্যাঙ' শব্দটিও গালি শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হতে শোনা যায়। 'পেঁচা', 'পেঁচামুখ', 'পেঁচামুখো' ইত্যাদির অর্থ হল– যার মুখে গম্ভীর বিষণ্নতা মাখানো। এগুলো অবশ্য নিন্দার্থে ব্যবহৃত হয়। 'ছুঁচো' শব্দটিতে গালি হিসেবে বেশ একটু তীব্রতা আছে। কাউকে পশ্চিবঙ্গে 'ছুঁচো' বলে গালি দিলে বোঝাবে –কাপুরুষ, মিথ্যেবাদী, কদর্য চরিত্রের ব্যক্তি যে স্বভাবত অতি নিম্নস্তরের লোক। 'বিচ্ছু' অর্থাৎ বৃশ্চিক বা বিছে শব্দটিও মৃদু নিন্দার্থে, কখনো বা আদরার্থে ছোটদের প্রতি প্রযুক্ত হয়, অর্থ– দুষ্টু।

সেই সব প্রাণীনাম, যেগুলো গালি হিসেবে ব্যবহৃত হয় নানা প্রকার যৌন ইঙ্গিতসহ সেগুলি উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করা অসুবিধাজনক, কারণ অশ্লীলতা সম্বন্ধে নালিশ ওঠার সম্ভাবনা এক্ষেত্রেও প্রচুর। বরং বৃক্ষনামের চেয়েও প্রাণীনামে তার সম্ভাবনা অনেক বেশি। তবে যে সব প্রাণীনাম এইভাবে ব্যবহৃত হয় বাংলা ভাষায় এখানে তার একটি ছোট তালিকা উপস্থিত করা যায় :

বিড়াল ঃ এর দুটি প্রসারিত প্রয়োগ আছে ;

(ক) হুলো (পুরুষ বিড়াল) ;

(খ) মেনি (স্ত্রী বিড়াল)।

গাই ঃ এর একটি প্রসারিত প্রয়োগ আছে ;

(ক) ভাগলপুরী গাই।

কুকুর ঃ এর দুটি প্রসারিত / বৈকল্পিক প্রয়োগ আছে ;

(ক) কুত্তা (পুরুষ কুকুর),

(খ) কুত্তি (স্ত্রী কুকুর)।

শুওর : ঢাকাই উপভাষায় বিকল্প উচ্চারণ হল ;
(ক) হুঅর।

বোকা : আসল অর্থ ছাগল, যদিও বাংলা ভাষায় এই অর্থটি একেবারে লুপ্ত।

খচ্চর : ঘোড়া ও গর্ধভের মিলনজাত, প্রজননক্ষমতাহীণ সঙ্কর শ্রেণীর, প্রধানত ভারবাহী, তৃণভোজী, চতুষ্পদ প্রাণী।

ঢ্যামনা : এটি বিশেষ এক জাতীয় সাপ। এই নামটি পশ্চিম বঙ্গে শোনা যায়। লোক বিশ্বাস এই যে এ সাপটিও সঙ্কর শ্রেণীর।

'বিড়াল' এবং 'গাই- এই দুটি প্রাণীনাম যৌন ইঙ্গিতবাহী গালি হিসাবে প্রযুক্ত হলে নারীদেহের প্রতি ইঙ্গিত করে। 'কুকুর' 'শুওর' এবং ' বোকা'- এই তিনটি প্রাণীনাম যৌন ইঙ্গিতবাহী গালি হিসাবে প্রযুক্ত হলে পশ্বাচারের ইঙ্গিতবাহী হয়ে ওঠে। আর 'খচ্চর' ও 'ঢ্যামনা'- এই দুটি প্রাণীনাম যৌন ইঙ্গিতবাহী গালি হিসাবে প্রযুক্ত হলে প্রজননক্ষমতাহীনতার প্রতি ইঙ্গিত করে। তবে 'শুওর' শব্দটি সম্বন্ধে বলা দরকার যে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের মধ্যে 'শুওর' শব্দটি গালি হিসেবে নিতান্তই সাধারণ অর্থেও ব্যবহৃত হয়। অনেক সময় এটি আদরার্থেও হাল্‌কা চালে বলা হয়। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে মধ্যপ্রাচ্যে আরব ও ইহুদি ধর্মে শূকরকে অপবিত্র জ্ঞানে সর্বরকমে বর্জন করার নির্দেশ আছে। তাই বাংলায় এই প্রাণীনামটির দ্বারা তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করার ব্যাপারটির পিছনে মধ্যপ্রাচ্যগত প্রভাব থাকতেও পারে।

বাংলা ভাষায় বহু প্রাণীনামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে নানা লোকবিশ্বাস ও সংস্কার। এগুলির ক্ষেত্রেও দুটি আলাদা শ্রেণী লক্ষ্য করা যায়- এক, প্রাণীনামে প্রকৃত অভিজ্ঞতা প্রসূত লোকবিশ্বাস ও সংস্কার; আরেক, প্রাণীনামে কল্পিত ধারণাজাত লোকবিশ্বাস ও সংস্কার। দুটি ছোট তালিকার মধ্যে এখন এই বিষয়টিকে সাজানোর চেষ্টা করা যেতে পারে :

প্রাণীনামে প্রকৃত অভিজ্ঞতাপ্রসূত লোকবিশ্বাস ও সংস্কার

ইঁদুর : কলে পড়া ইঁদুর।

কই মাছ : কই মাছের জান।

কপোত : কপোত-কপোতী যথা।

গরু : যে গরু দুধ দেয় তার লাথি সহ্য হয় ;
গরুর মত ড্যাবড্যাব করে দেখা।

গাধা	ঃ ধোপার গাধা ; গাধার ডাক।
ঘুঘু	ঃ ভিটেতে ঘুঘু চরা ; ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখনি ; বারে বারে ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান।
ঘুণ	ঃ ঘুণ ধরা।
ছুঁচো } সাপ	ঃ সাপের ছুঁচো গেলা।
জোঁক	ঃ ছিনে জোঁকের মত লেগে থাকা।
পিঁপড়ে	ঃ পিঁপড়ের ডানা গজানো।
পিপীলিকা	ঃ পিপীলিকার পাখা ওঠে মরিবার তরে।
পুঁটিমাছ	ঃ চুনো পুঁটি ; পুঁটি মাছের প্রাণ ; পুঁটি অল্প জলে ফরফরায় ; গণ্ডুমাত্র জলে শফরী (পুঁটিমাছ) ফরফরায়।
ফেউ	ঃ ফেউ লেগে থাকা ; বাঘের পেছনে ফেউ।
বলদ	ঃ কলুর বলদ ; ঘানির বলদ ।
বাদুর	ঃ বাদুর ঝোলা।
বেড়াল	ঃ ভিজে বেড়াল।
ব্যাঙ	ঃ কুয়োর ব্যাঙ।
মুরগি	ঃ রান্ধে মুরগি, কয় ডাইল।
রুই-কাতলা	ঃ বড় বড় রুই-কাতলা।
ষাঁড়	ঃ ষাঁড়ের গোঁ।

প্রাণীনামে কল্পিত ধারণাজাত লোকবিশ্বাস ও সংস্কার

ইদুর } ছুঁচো	ঃ পেটে ইঁদুরের / ছুঁচোর ডন মারা।

কুত্তা	ঃ বৌরিশ কুত্তা না ঘরকা না ঘাটকা[২]
ঘুঘু	ঃ বাস্তুঘুঘু।
ছুঁচো	ঃ ছুঁচোর কীর্তন।
পিঁপড়ে উকুন	ঃ মাটিতে রাখলে পিঁপড়েয় খায়, মাথায় রাখলে উকুনে খায়।
বলদ	ঃ চিনির বলদ।
বাঘ সাপ	ঃ বাঘের দেখা, সাপের লেখা।
বাঘ শেয়াল	ঃ বাঘ নেই বলে শেয়াল রাজা।
বাঘ খাডাশ	ঃ বাঘ নাই বলে খাডাশ রাজা।
বাঁদর	ঃ বাঁদরের পিঠে ভাগ।
বেজি	ঃ মন্দ বড় তেজি . . . . . . টেনে নিয়ে গেল বেজি।
বেড়াল শেয়াল	ঃ বেড়ালের এক বুদ্ধি, শেয়ালের নয় বুদ্ধি।
বোয়াল	ঃ রাঘব বোয়াল।
ভেড়া	ঃ ভেড়ার গোয়ালে আগুন লাগা।
মাছি	ঃ মাছি মারা (কেরানি)।
শোল মাছ	ঃ পোড়া শোল মাছ জ্যান্ত হয়ে পালিয়ে যায়।
সাপ	ঃ বিষ নেই সাপের কুলোপানা চক্র ; বিষ নেই সাপের ফোস্ আছে।
হাতি চামচিকে	ঃ হাতি যখন কাদায় পড়ে, চামচিকেতে লাথি মারে।

হাতি
ঘোড়া } ঃ হাতি ঘোড়া গেল তল, মশায় বলে কত জল।
মশা

সবিনয়ে স্বীকার করা ভালো যে এই স্বল্প সংখ্যক উদাহরণ বিষয়টির ব্যাপকতা ও তাৎপর্যের গভীরতা অনুধাবন করার পক্ষে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর।

সমগ্র বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের আনাচে-কানাচে তন্নতন্ন করে বিষয়টি নিয়ে অনুসন্ধান অবিলম্বে শুরু করা উচিত। লৌকিক স্মৃতি থেকে এর অধিকাংশই লুপ্ত হয়ে যাবার সম্ভাবনা প্রবল। কারণ যে গ্রাম্য লৌকিক জীবন থেকে এসব বিশিষ্ট প্রয়োগ, লোকবিশ্বাস এবং সংস্কার উদ্ভূত হয়েছিল দ্রুত শিল্পায়ন এবং প্রবল নগরায়নের তলায় সেই জীবন চাপা পড়ে যাচ্ছে ক্রমশ।

বর্তমান প্রবন্ধে যে অল্প সংখ্যক উদাহরণ তুলে ধরা হল এবং যে যৎসামান্য আলোচনা করা হল তা কেবল সুধী পাঠকের মনোযোগ এদিকে আকৃষ্ট করার জন্য এবং বিষয়টিকে একটি কাঠামোগত শৃঙ্খলার মধ্যে নিয়ে আসার জন্য।।

টীকা

১. উদাহরণসহ বিষয়টি আলোচনার করার পথে দুটি প্রধান বাধা। প্রথমত, বাংলা ভাষায় উপযুক্ত পারিভাষিক শব্দের অভাবে আলোচনাটি বিশুদ্ধ বিজ্ঞান আলোচনার স্তরে উন্নীত করা কষ্টসাধ্য। দ্বিতীয়, বিষয়গুলি সম্বন্ধে খোলামেলা আলোচনার ঐতিহ্য গড়ে না ওঠায় যিনি প্রথম এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হবেন তিনিই কুরুচি এবং অশ্লীলতার অভিযোগে অভিযুক্ত হতে পারেন।

২. ভাষা হিন্দি হলেও বাঙালীর মুখে প্রায়ই শোনা যায়।

গ্রীক গীতিকবিতা ঃ একক

মোবাশ্বের আলী *

প্রাচীন গ্রীক একক গীত/গীতিকবিতা রচনার ক্ষেত্রে আল-সেঅস ও স্যাফোর নাম সমস্বরে উচ্চারিত হয়। প্রাচীন গ্রীসের লেসবসে খ্রিষ্টপূর্ব সপ্তম শতকের শেষ ভাগে তাঁরা কাব্য রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। জীবনের প্রথম ভাগে আল-সেঅস ছিলেন যোদ্ধা ও রাজনীতিক। বিভিন্ন সময়ে তিনি যুদ্ধে পরাজয়, বন্দীত্ব, নির্বাসন প্রভৃতির মধ্যে জীবন কাটান। তাঁর রচনার মধ্যে রয়েছে মদ্যপানমূলক, রাজনৈতিক এবং প্রেমমূলক কবিতা। অস্ত্রের মহিমা, স্বৈরাচারের বিরোধিতা, মদ্যের প্রশস্তি, প্রকৃতির রূপ, সত্যের অন্বেষণ — প্রভৃতি বিচিত্র বিষয় তাঁর রচনায় স্থান পেয়েছে। হোরেসসহ অনেকের উপর তাঁর ব্যাপক প্রভাব লক্ষ করা যায়।

স্যাফো ছিলেন হেলেনিক সমাজের মহিলা গীতিকবি। প্লেটোর বর্ণনায় দশম মিউজ, অ্যারিস্টটলের মতে হোমারের সমতুল্য স্যাফো বিশ্বের প্রথম মহিলা কবিগোষ্ঠী thiason গঠন করেন। তরুণীদের প্রতি আবেগ-উৎসারিত প্রেম তার কবিতার মূল উপজীব্য ; সঙ্গে আছে প্রকৃতির জয়গান।

* অবসর প্রাপ্ত অধ্যক্ষ, সরকারী কলেজ

আল-সেঅস

এক

বিশ্বের একক গীতিকবিদের মধ্যে আল-সেঅস-এর নাম সর্বপ্রথম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণযোগ্য। তাঁর সাথে আরো স্মরণ করতে হয় স্যাফো- বিশ্বের প্রথম মহিলা গীতিকবি।

একক গীত বা গীতিকবিতা রচনার ক্ষেত্রে গ্রীকদেশে আল-সেঅস ও স্যাফোর নাম সমস্বরে উচ্চারিত হয়ে থাকে। উভয়ে একক গীতের ক্ষেত্রে পারঙ্গমতার পরিচয় দিয়েছেন – যেমন সমবেত গীত বা একতান রচনায় পিণ্ডার। আল-সেঅস ও স্যাফো উভয়ে গ্রীসদেশের অন্তর্গত লেস্‌বসের অধিবাসী। উভয়ের সঠিক জন্ম বা মৃত্যুতারিখ জানা যায় নি। তবে দুজনে বেঁচে ছিলেন ৪২ অলিম্পিয়াড-এ[১]। তাঁদের জন্ম খ্রি.পূ. সপ্তম শতকের মাঝামাঝি এবং এই শতকের শেষভাগে তাঁরা কাব্যরচনায় ব্যাপৃত থাকেন।

আল-সেঅস সমসাময়িক রাজনীতির সাথে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত এবং কতিপয় তন্ত্রের গোড়া সমর্থক। তাঁর জীবনটা কাটে যুদ্ধে যুদ্ধে। প্রথমে এথেন্সের বিরুদ্ধে Sige দখল নিয়ে। পরাজিত হয়ে শত্রুপক্ষের কাছে সিল্‌ড সমর্পণ করতে বাধ্য হলেন। এরপর টাইর‍্যান্ট Melanchrits এবং তাঁর উত্তরাধিকারী Myrsilus-এর বিরুদ্ধে।

টাইর‍্যান্টদের জোর করে ক্ষমতা দখলের, আবার জনসাধারণের কতিপয় তন্ত্র উচ্ছেদের প্রয়াসের তিনি ঘোরতর বিরোধিতা করেন। অসি আর মসি এই দুই দিয়ে তিনি *টাইর‍্যান্ট* ও জনসাধারণ উভয়ের বিরুদ্ধে লড়াই করেন। পরিণামে তাঁকে কারাবরণ করতে হয়। পিটাকাস, যিনি একটি জনপ্রিয় সরকার প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁকে কারাগারে পাঠান। পরবর্তীকালে পিটাকাস তাঁকে মুক্ত করেন এই মন্তব্য করে যে প্রতিহিংসার চাইতে ক্ষমা ভাল।

অবশেষে তাঁকে পনের বছরের জন্য নির্বাসিত করা হয়।[২] কিছুকাল তিনি মিসরে বাস করেন। সম্রাট হোফরার দরবারে এবং অন্যত্র তিনি সৈনিকরূপে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর ভাই এন্টিমেনিদেস ব্যাবিলনে নেবুচাদনেজার-এর অধীনে কাজ নেন, একজন কথিত দৈত্যকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাজিত ও হত্যা করেন। তিনি সাহসী যোদ্ধা ছিলেন। তবে যুদ্ধে তাঁর সঠিক ভূমিকা কি, তথ্যাদির অভাবে নিশ্চিত জানা যায় না।

দশ খণ্ডে রচিত তাঁর কবিতাবলি। এগুলোকে মূলত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় — মদ্যপানমূলক, রাজনীতিমূলক এবং প্রেমমূলক। মদ হচ্ছে তাঁর কবিতার

মূল প্রেরণা। মদ উপজীব্য করে তিনি ব্যক্তিগত এবং রাজনীতিক বন্ধুদের কাছে অধিকাংশ কবিতা লিখেছেন। তা হলেও কিছু কিছু কবিতায় প্রেম ও রাজনীতি প্রাধান্য লাভ করেছে।

প্রথমেই বলা প্রয়োজন, তাঁর কবিতার একটি সামগ্রিক মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়, কেননা তাঁর কবিতাবলি সম্পূর্ণ আমাদের কাছে এসে পৌছেনি। বৈয়াকরণিকদের[৩] উদ্ধৃতিতে তাঁর কবিতার কিছু কিছু নমুনা মেলে। বৈয়াকরণিকেরা এসব উদ্ধৃতি দিয়েছেন ছন্দ-বিশ্লেষণ ও ভাষা-বিশ্লেষণের জন্যে। অথচ আলেকজান্দ্রিয়ায় তাঁর কবিতার দশটি খণ্ড ছিল বলে জানা যায়[৪]।

রাজনীতিক কবিতা রচনায় তাঁর প্রবল উৎসাহ লক্ষ করা যায়। তিনি কবিতায় যুদ্ধাস্ত্রের উল্লেখ করেছেন এবং এর প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন। আবার রাজনীতিক সংগ্রামের তারিফ করে কবিতা লিখেছেন এবং সংগ্রামী বীরকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। যেমন :

ধরণির শেষ প্রান্ত হতে এস তুমি
ফিরে এস তোমার গ্রহে
তোমার তরবারির হাতির দাঁতের হাতল
সোনা দিয়ে মোড়ানো ;
যেহেতু ব্যাবিলনের প্রয়োজনের মুহূর্তে
তাদের জন্য করেছ মস্ত কীর্তি
করেছ হত্যা শক্তিশালী ব্যায়ামগীর এক বীর।

তাঁর কবিতায় অস্ত্র প্রাধান্য লাভ করেছে। একটি কবিতায় বর্ণিত হয়েছে তাঁর অস্ত্রাগার -চকচকে হেলমেট, দেয়ালে টাঙানো পিতলে মোড়ানো বর্ম, মেঝের ওপর স্তূপীকৃত ঢাল। আরেকটি কবিতায় তিনি তাকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন, যে ভাই নেবুচাদনেজার- এর দরবারে এক কথিত দৈত্যকে হত্যা করে একটি হাতির দাঁতের তৈরি হাতলের তরবারি অর্জন করে দেশে ফিরে এসেছে।

রাজনীতিক কবিতাগুলো তাঁর ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ জীবনের প্রতি আলোকপাত করে। রাজনীতিক কারণে তাঁকে কারাবরণ করতে হয়েছে। *টাইর্যান্টদের* অত্যাচারে তাঁর জীবন দুর্ভর হয়ে উঠেছে। সেই *টাইর্যান্টদের* প্রতি তাঁর প্রবল ঘৃণা উচ্চারিত হয়েছে। *টাইর্যান্ট* Myrsilus-এর মৃত্যু হলে তিনি দারুণ উৎফুল্ল হয়ে গেয়ে উঠেন :

এসো, আমরা এখন পান করি মদ।

স্বৈরাচার বিরোধিতার মধ্যে তাঁর রাজনীতিক কবিতার শ্রেষ্ঠতা। প্রাচীনকালে এই সকল রাজনীতিক কবিতা উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে। প্রশংসা করেছেন হ্যালিকারনাসুস-এর ডায়োনিসয়াস, অ্যাথেনিউস, কুইনটিলিয়ান প্রমুখের। তবে এ-সকল কবিতা উদ্দীপক হলেও মহৎ সৃষ্টির পর্যায়ে পড়ে না।

মদ্যপানমূলক কবিতায় তিনি মদের প্রশস্তি গেয়েছেন, জীবনের প্রতি গভীর ভাবনা চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন, নানা ঋতুর বর্ণনা করেছেন এবং প্রকৃতির কথা বলেছেন। কবির মতে, সকল ঋতুই মদ্য-উৎসবের উপযোগী। হাঁড় কাঁপানো শীতে, গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহে প্রবল ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্যে, মৃদু চন্দ্রালোকে, সূর্যের উজ্জ্বল আলোতে - কবি সবাইকে আমন্ত্রণ জানাছেন প্রাণভরে মদ পান করার জন্যে। তিনি ইপিকিউরিয়ান নন।[৫] ইপিকিউরিয়ানরা শুধু আনন্দ বা ফূর্তি করার জন্যেই মদ্যপান করেছে এবং মদ্যপান করে জীবনের দুঃখকে ভুলতে চেয়েছে। কিন্তু তিনি মদ্যপানকে একটি নান্দনিক অভিজ্ঞতায় রূপান্তরিত করেছেন। উদাহরণস্বরূপ একটি কবিতার উল্লেখ করা যায় :

জিউসের বৃষ্টি আসছে নেমে এবং উচ্চ স্বর্গ হতে উঠছে ঝড়
এবং ছোট নদীর পানির ধারায় চাঙায় জমেছে বরফ ;
তাহলে এস উঠে! কর শীতকে কাবু, জ্বালো আগুন
শিখা তার উর্ধ্বে আরো উর্ধ্বে
মেশাও মদ মৌমাছির মধুর মতো মিষ্টি প্রচুর পরিমাণে;
আরামদায়ক পশমে ললাট ঢেকে রেখে পান কর মদ।
দুঃখে ভরে তুলো না আমাদের হৃদয় অথবা বৃথা ভাবনায়
হয়ো না বিহ্বল;
কেননা দুঃখ আমাদের এনে দেবে না এতটুকু ফায়দা, বন্ধু আমার,
হবে না উন্নতি।
কিন্তু এই হল আমাদের উত্তম হাওয়া, ভরপুর মদ
দূর করবে ভাবনা।

তিনি বলেছেন, মদ সকল প্রকার অসুখ দূরীভূত করে এবং মানসিক প্রশান্তি এনে দেয়।

রোমান কবি হোরেস তাঁর মদ্যপানমূলক কবিতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছেন।[৬] এর থেকে সুস্পষ্ট হয় যে তিনি পরবর্তীকালে কিভাবে প্রভাব সঞ্চার করেছেন। তাঁর সাথে হোরেসের সাদৃশ্য মেলে। উভয়ের কবিতায় গভীরতার চাইতে চাকচিক্য বেশী।

তিনি প্রকৃতির সাথে সম্পূর্ণ একাত্ম হতে পারেননি। যখন ঝড় বয়ে যায়, নদী বরফ হয়ে যায়; ফল পাকতে শুরু করে, পাখি গান গেয়ে ওঠে, কবি হঠাৎ একটা বিপরীত সুর উচ্চারণ করে বলেন, 'চলো, আমরা পান করি।' সে-সময় প্রকৃতির সৌন্দর্য ম্লান হয়ে যায়। তাঁর কবিতায়, ম্লান প্রকৃতি এসেছে মানুষের পটভূমিরূপে। তাঁর প্রেমের কবিতা আমাদের কাছে এসেছে টুকরো টুকরো। সুতরাং অসম্পূর্ণ উপাদান নিয়ে প্রেমের কবিরূপে তাঁর যথার্থ মূল্যায়ন সম্ভব নয়।

তিনি যোদ্ধার জীবনে, নির্বাসিতের জীবনে, ভ্রাম্যমানের জীবনে মদ ও প্রেমের কবিতা লিখেছেন। হোরেস তাঁর প্রেমের কবিতার প্রশংসা করেছেন আবেগভরে। হোরেস তাঁর প্রণয়-পাত্র লাইকাসের বর্ণনা দিয়েছেন :

এবং লাইকাস, সুন্দর ও তরুণ,
কালো কেশ, কালো চোখ

লাইকাস হল যোদ্ধাকবির স্কোয়ার বা অনুচর - মধ্যযুগে নাইটদের স্কোয়ারের মতো, যেমন ডন কুইকসোটের স্কোয়ার সাঙ্কো পাঞ্জা। আধুনিককালে প্রণয়পাত্ররূপে পুরুষ ন্যাক্কারজনক; কিন্তু হেলেনিক সমাজে তা স্বাভাবিকভাবে গৃহীত হয়েছে। সিসারো থেকে জানা যায়, লাইকাস-এর আঙুলে একটি জড়ুল ছিল।

তাঁর প্রেমের কবিতার সারকথা হল :

Wine dear boy, and truth .

অর্থাৎ প্রিয়পাত্রের সঙ্গে মদ্যপান করতে করতে সত্যকে অন্বেষণ করবেন। তিনি আদৌ স্যাফোর প্রেমে পড়েছিলেন কিনা, সঠিক জানা যায় না। তিনি একটি কবিতায় স্যাফোকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন :

Violet- crowned, pare, sweetty smiling Sappho !
I want to say something, but shame prevents me.

প্রত্যুত্তরে স্যাফো যে কবিতা লেখেন, তা গদ্যে তরজমা করলে দাঁড়ায় :

> যদি তোমার আকাঙ্ক্ষা নির্মল ও মহৎ হয়, যদি তুমি হেয় কিছু উচ্চারণ না কর, তাহলে লজ্জা তোমার চোখ আবৃত করবেনা, কিন্তু তুমি তোমার যথার্থ অভিলাষ ব্যক্ত করতে পারবে।

হয়তো এই সকল উপাদান ভিত্তি করে দুইজনের মধ্যে রোমান্সের একটা ধারনা গড়ে ওঠে এবং গ্রীক *ভাস* বা মাটির পাত্রে তাঁদের যুগল চিত্র অঙ্কিত হতে দেখা যায়।

প্রাচীনকালে তিনি যে কবিরূপে খ্যাতিলাভ করেন এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই, বিশেষত যখন দেখা যায় *অ্যালকাইক* এই চতুষ্পদীটির নাম তাঁর থেকে এসেছে।

তাঁর রচনাশৈলীর বৈশিষ্ট্য হল সংক্ষিপ্ততা ও উজ্জ্বলতা। তিনি তাঁর লেসবসের আঞ্চলিক ভাষায় লিখেছেন। তাঁর কবিতার বা গানের ভাষা প্রাত্যহিক জীবনের ভাষার কাছাকাছি। তিনি কখনো চমক সৃষ্টির প্রয়াস পান নি। তাঁর কবিতার সুর সহজ, অন্তরঙ্গ ও ব্যক্তিগত। তাঁর কবিতার প্রতিটি চরণে মাধুর্য রয়েছে। তাঁর ভাষা স্বতঃস্ফূর্ত ও সাংগীতিক — মনে হয় যেন একেবারে অন্তর থেকে এসেছে। একান্ত ব্যক্তিগত বলেই তাঁর কবিতায় গীতিসুর ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। বিচিত্র বিষয় নিয়ে তিনি কবিতা লেখেননি। সীমিত গন্ডির মধ্যে তিনি কবিতা লিখেছেন এবং ভালো কবিতা লিখেছেন। তিনি আবেগপ্রবণ হলেও আবেগতাড়িত হননি। সুখের বিষয় রোমান কবি হোরেস তাঁকে আদর্শরূপে গ্রহণ করেছেন।

২৬০০ বছর পর গ্রীসের এই গীতিকবি আল-সেঅস এর সাথে বাংলাদেশের জাতীয় কবি নজরুল[৭] এর কোনো কোনো ক্ষেত্রে আশ্চর্য সাদৃশ্য মেলে।

স্যাফো

এক

বিশ্বের মহিলা গীতিকবিদের মধ্যে স্যাফোর স্থান একেবারে শীর্ষে। হেলেনিক সমাজে– যে সমাজে নারীর স্থান ছিল সীমিত ও গন্ডিবদ্ধ– সেখানে স্যাফোর আবির্ভাব এক বিস্ময়কর ব্যাপার । তাই তাঁকে নিয়ে গড়ে ওঠে কত কল্প- কাহিনী!

তিনি হয়ে ওঠেন রোমান্সের নায়িকা। তিনি নাকি পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেন — ফেয়ন নামের এক রাখালের জন্যে ব্যর্থ প্রেমের হতাশায়, আবার *অ্যাটিক কমেডিতে*[৮] তাঁকে নিয়ে করা হয় কত ঠাট্টা-তামাশা।

মধ্যযুগে নীতিহীনতার অভিযোগে তিনি আক্রান্ত হয়েছেন। আলেকজান্দ্রিয়া ও কনস্টান্টিনেপোলে[৯] তাঁর কবিতার পুস্তক জনসাধারণ্যে ভস্মীভূত করা হয়। আবার আধুনিক কালে মনোবিজ্ঞানের জনক ফ্রয়েড তাঁর জীবনগাথা ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত করেছেন *লেসবিয়ানিজম* অর্থাৎ নারী সমকামিতার তত্ত্ব বা মতবাদ।[১০]

নীতিহীনতার সকল অভিযোগ সত্ত্বেও তাঁর কবিতার সৌন্দর্য এতটুকু ম্লান হয়নি ২৬০০ বছরের মধ্যেও। দেবী আফ্রোদিতের বরকন্যা তিনি। দেবীর হাসির বর্ণনা দিয়েছেন এই বলে :

Smiling with undying lips

তাঁর কবিতায়ও রয়েছে মৃত্যুহীন সৌন্দর্য। তাই দীর্ঘকালের ব্যবধানেও এই হেলেনিক কবিকে বর্তমান কালের পাঠকের কাছে তুলে ধরার দায়িত্ব অনুভব করছি।

দুই

স্যাফো ও আল-সেঅস, এই দুই গীতিকবি প্রায় সমসাময়িক, তবে স্যাফো বয়সে ছোট। স্যাফো আল-সেঅস-এর তরুণ সহধরী। খ্রিষ্টপূর্ব সপ্তম শতকে তাঁরা কাব্য রচনায় ব্রতী হয়েছেন। উভয়ের জন্ম গ্রীসদেশের লেসবস-এ। আবার দু'জনে একক গীত বা গীতিকবিতা রচনা করেছেন। আল-সেঅস গীতিকবিতা লিখেছেন যুদ্ধ, মদ ও প্রেম নিয়ে; আর স্যাফোর গীতিকবিতার উপজীব্য শুধু প্রেম। তবে প্রতিভায় স্যাফো আল-সেঅসকে অতিক্রম করে গেছেন।

প্রাচীনকালে তিনি মহিলা কবিরূপে বিশেষ খ্যাতি ও মর্যাদা লাভ করেন; আবার আদি কবি হোমারের পরেই তাঁর স্থান হয়। এমন কি, হোমারের সঙ্গেও তাঁর নাম উচ্চারিত হতে দেখা যায়।

তিনি মহিলা কবিদের একটি গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁকে অনুসরণ করে মহিলা কবিরা কবিতা লিখতে শুরু করেন। তবে শুনলে অবাক মনে হবে, ২৬০০ বছরের মধ্যে বিশ্বের মহিলা কবিদের কেউ তাঁকে আজ অবধি অতিক্রম করতে পারেন নি।

তিনি হোমারের সাথে একাসনে বসার উপযোগী, সমালোচক শিরোমণি অ্যারিস্টটল এই অভিমত স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রনায়ক সোলন[১১] তাঁর একটি গীতিকবিতা শুনে আবেগভরে প্রার্থনা করেন ঃ এই কবিতা না লেখা অবধি তাঁর যেন মৃত্যু না ঘটে। প্লেটোর সংলাপ *ফিড্রাস*-এ তাঁকে দশম *মিউজ* বলে অভিহিত করা হয়েছে। লংগিনাস *Treatise on the Sublime*-এ তাঁর[১২] প্রেমের কবিতাকে কাব্যিক মহিমার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলে উপস্থাপিত করেছেন। স্ট্রাবো তাঁর কবিপ্রতিভার কথা বলতে গিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন। এ্যাপিগ্রামিস্টরা তাঁকে প্রেমের দেবী আফ্রোদিতের সন্তান বলে অভিহিত করেছেন। আরও বলেছেন– হেলানের গৌরব, *মিউজ*-এর *পিয়ার* বা সখা এবং অ্যাপোলোর সঙ্গী। তাঁর কবিতা সর্বত্র পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের আধার বলে নন্দিত। লেসবসের এই অধিবাসিনীর জন্ম এক অভিজাত পরিবারে। ঐতিহাসিক হেরোডটাসের[১৩] মতে তাঁর পিতার নাম স্কাইমেন্‌ড্রেনিমন, ভাই চারাকলুস।

আল-সেঅস স্যাফোর প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব করেন, কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। কেননা তাঁদের দুজনের মধ্যে অনেক ব্যবধান। আর এই কথাটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে স্যাফোর একটি কবিতায় :

> এই কুটিল পৃথিবীতে, কেউ বলে, সব চাইতে ভালোবাসার পাত্র হল একদল অশ্বারোহী, আবার কেউ কেউ বলে পদাতিক সেনা, অন্যরা বলে জাহাজের কথা; কিন্তু আমি বলি আর কিছু না হোক, অন্তত একটি ভালোবাসার পুরুষ।

এই কবিতার তাৎপর্য সংক্ষেপে বলতে গেলে, আল-সেঅস একজন যোদ্ধা ও ভ্রাম্যমান, আর তিনি হচ্ছেন এক প্রেমগত প্রাণ। সুতরাং তাঁদের মিলন কখনও অভিপ্রেত নয়। অপরদিকে দেখা যায়, তিনি রাখাল ফেয়নকে ভালোবাসেন। আর এই ভালোবাসার ফসল হল ক্লেয়িস নামে এক কন্যা।

লেসবসের রাজনীতিক ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যে আল-সেঅসের মতোই তিনি বড় হয়ে ওঠেন — যদিও ব্যক্তিগতভাবে রাজনীতির প্রতি তাঁর বড় একটা আগ্রহ দেখা যায় না। তবু লেসবসে বিদ্রোহ হলে অন্যান্য অভিজাতের মতো তিনিও সিসিলিতে নির্বাসিত হলেন। সিসিলির সাইরাকুসে তিনি আশ্রয় গ্রহণ করেন। আমৃত্যু তিনি সেখানে গান করেন। তাঁর একটি কবিতায় আছে :

> পক্ক তাঁর কেশ, জরাগ্রস্ত দেহ।

সাইরাকুসে চতুর্থ শতকে তাঁর একটি মূর্তি তৈরি করেন ভাস্কর সিকামেয়ন। মূর্তিটি নগর মিলনায়তনের শোভা বর্ধন করে।

তিন

কতিপয় তরুণী নিয়ে তিনি একটি গোষ্ঠী বা thiasos গড়ে তুলেন। তাঁর জীবনে ও কবিতায় এই সকল তরুণীরা প্রাধান্য লাভ করেছে। এই সকল তরুণীর প্রতি তিনি ভগ্নিসুলভ বা মাতৃসুলভ আবেগ অনুভব করেন নি, বরং প্রচণ্ড প্রবল প্রেমাবেগে তাড়িত হয়েছেন। লেসবস দ্বীপের অধিবাসী এই মহিলা কবির বিশেষ আচরণ থেকে ফ্রয়েড *লেসবিয়ান* তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন।

তরুণীদের মধ্যে এট্টহিস তাঁর বিশেষ প্রণয়পাত্রী। তাঁর একটি কবিতায় আছে :

তোমায় আমি ভালোবেসেছি, এট্টহিস —
কত কাল আগে!

তাঁর সময় কাটে এই সকল তরুণীর সাথে। গানে-উৎসবে-আনন্দে তিনি তাদের নিয়ে মহানন্দে দিন যাপন করেন।

তিনি অন্তরের ভেতর প্রেমের প্রবল আবেগ অনুভব করেন। তাঁর প্রত্যয় এই যে তিনি দেবী আফ্রোদিতের[১৪] আশীর্বাদধন্যা; তাঁর জীবন ও কবিতার মূল ভিত্তি প্রেম। এবং তাঁর বিশ্বাস এই প্রেমের উৎস আফ্রোদিতে-প্রেম ও সৌন্দর্যের দেবী।

একটি দীর্ঘ কবিতায় তিনি দেবী আফ্রোদিতেকে স্মরণ করেছেন — আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে দেবী কিভাবে রথে করে স্বর্গ হতে অবতরণ করেছিলেন তাঁর ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধানের জন্যে। তিনি আবার বিপদে পড়েছেন, আবার দেবীর সাহায্য চাইছেন। তিনি নিশ্চিত যে দেবী তাঁর ব্রত উদযাপনে সহায়তা করবেন। দেবীর সাহায্য প্রর্থনা করে তিনি লিখেছেন :

যদিও এখন তিনি পলাতকা, তবু শিগগির তোমায় দেবেন ধরা,
যদিও তিনি নেন না কোনো উপহার তাও শিগগির তোমায় দেবেন উপহার,
যদিও তিনি এখনও তোমায় ভালোবাসেন না, তবু তোমায় ভালোবাসবেন
শিগগির অনিচ্ছাসত্ত্বে হলেও —

দেবী আফ্রোদিতে তাকে সম্মোহিত করেছে। সে-কারণে তার আবেগ কখনও বিসদৃশ বলে মনে হয় না, বরং এর মধ্যে আছে একপ্রকার দিব্য জ্যোতি।

উল্লেখ্য, আফ্রোদিতের উদ্দেশ্যে লেখা তাঁর এই কবিতাটি মাত্র আমরা সম্পূর্ণ রূপে পাই। তাঁর অপর সকল কবিতা বিলুপ্ত ও বিনষ্ট হয়ে গেছে। যে-সকল কবিতা মেলে, সেগুলো শুধু খণ্ডাকারে। মানুষের রোষ, মানুষের ক্ষুদ্রতা-ভণ্ডতা-অন্ধতা বিশ্বের এবং গ্রীসদেশের প্রথম মহিলা কবির সৃষ্টিকে এমনি করেই ধ্বংস করে দিয়েছে।

আলেকজান্দ্রিয়ার পণ্ডিতেরা তাঁকে গ্রীসের প্রাচীন নয়জন গীতিকবির মধ্যে অন্যতম বলে উল্লেখ করেছেন । তাঁদের এই উক্তি অতিশয়োক্তি নয়। সুইনবার্নের *Essays and Studies*-এ তিনি উচ্চ প্রশংসিত হয়েছেন। সুইনবার্ন লক্ষ করেছেন, তাঁর মধ্যে যে অনির্বচনীয় মাধুর্য রয়েছে তা স্বর্গীয়— যেন স্বর্গের সুষমা তাঁর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। একালের ইংরেজ কবি আরো লক্ষ করেছেন, পুরাকালের গ্রীসের এই মহিলা কবির প্রবল আবেগ ও গভীর বেদনা দেবতার মহিমা দিয়ে মণ্ডিত। সুইনবার্ন আরো একটা কথা যথার্থ বলেছেন : *The highest lyric work is either passimate or imaginative.* শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতা হয় আবেগপ্রধান, নয় কল্পনাপ্রবণ। এ-কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়, আবেগপ্রবণ গীতিকবিতার ক্ষেত্রে স্যাফোর স্থান একেবারে শীর্ষে। এবং ২৬০০ বছরের মধ্যে তাঁর জুড়ি বড় একটা মেলে না।

তাঁর সাথে অনেক তরুণীর গভীর প্রেম-সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। হয়তো কোনো তরুণীর সাথে প্রেম-সম্পর্ক ঘনীভূত হতে না হতেই সেই তরুণীর বিয়ে হয়ে যায় আর তিনি নিঃসঙ্গতার বেদনা অনুভব করেন। এই সময় তাঁকে আত্মহত্যার ভাবনা পেয়ে বসে। কিন্তু ধীরে ধীরে তিনি নিজেকে শান্ত করে নেন এবং অতীতের সুখের দিনগুলোর স্মৃতিচারণ করে এক ধরনের আনন্দলাভ করেন। তাঁর ভালোবাসা ক্রম-সম্প্রসারণশীল। কোনো তরুণীর জন্যে তাঁর ভালবাসা অন্য সকল তরুণীর মধ্যে সঞ্চারিত হয়। একটি তরুণী সমুদ্রের ওপারে লিডিয়ায় চলে গেলে তিনি ওর কথা ওর বন্ধুদের বলেন। মেয়েটিকে তুলনা করেন চাঁদের সাথে — যে চাঁদ উজ্জ্বলতায় চারদিকে ছড়িয়ে যায়, বিকীর্ণ করে আলো স্থলে ও সমুদ্রে, শিশিরে ভিজিয়ে ফুলকে করে তোলে সজীব।

তরুণীদের বিয়ে হয়ে গেলেও তিনি কিন্তু তাদের জন্য বিবাহ-সংগীত রচনা করেন না। তাঁর এ-ধরনের নীরব ভূমিকার জন্যে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের প্রয়োজন

রয়েছে। একটি তরুণীর বিয়ে হয়েছে কিছুটা বিলম্বে। এই মেয়েটির সাথে তিনি তুলনা করেছেন গাছের উপর মিষ্টি আপেলের, যে আপেলের জন্যে এখনও সংগ্রাহক এসে পৌঁছেনি। আবার তুলনা করেছেন লিলি ফুলের সাথে, যে ফুল পাহাড়ের উপর রাখালেরা মাড়িয়ে দিয়ে চলে যায়, আর রক্তবর্ণের ফুল ছিন্নভিন্ন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

তিনি একটি দ্বৈতসংগীত রচনা করেছেন। এর মধ্যে আছে এক বধূ, আর তার কুমারীসত্তা। বধূ বলছে :

ওলো কুমারী, ওলো কুমারী, তুই কোথায়
আমা হ'তে গেছিস কোনখানে ?

কুমারীসত্তা বলছে :

আর কখনো আমি আনব না উহারে,
আর কখনও তোমার কাছে আসব না গো ফিরে।

তাঁর প্রেমে অধিকারসূচক কিছু নেই। তিনি জানেন, যাদের তিনি ভালোবাসেন, তাদের জীবনের যথার্থ ও অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হল অন্যের সাথে বিবাহ-বন্ধন। সুতরাং তাদের ধরে রাখার কোনো উপায় নেই। ফলে একটা বেদনা-বোধ তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। এবং তাঁর কবিতায় দেখা যায় একটা বিষাদময়তা। বলা হয়েছে, তিনি কবিতায় মূলত যে প্রেমাবেগের কথা বলেছেন তা নারীর প্রতি নারীর — নারী ও পুরুষের নয়। এই নারী সমকামিতা বা *লেসবিয়ানিজম*-এর জন্যে তাঁকে দোষারোপ করে লাভ নেই। সেক্‌সপীয়ারেও আছে *love for a fair boy*। হোরেস অবশ্য নিন্দা করে বলেছেন পুরুষালি স্যাফো। কিন্তু রোমান কবি কাটাল্‌লুস তাঁর প্রেমের কবিতা অনুবাদ করেছেন এবং তাঁর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছেন। লংগিনাস তাঁর প্রেমের কবিতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন এবং বলেছেন যে এর মধ্যে শুধু একটি মাত্র আবেগ নয়, বরং বিচিত্র আবেগের সম্মেলন ঘটেছে।

শুনলে আশ্চর্য মনে হতে পারে, তাঁর প্রেমের কবিতা রোগীর জন্য ঔষধরূপে নির্ণীত হয়েছে। এক গ্রীক চিকিৎসক রোগ নির্ণয়ক গ্রন্থে তাঁর প্রেমের কবিতাকে সকল রোগের প্রকোপ প্রশমিত হবার নিদান হিসেবে নির্ণয় করেছেন।

চার

তার মধ্যে মূলত তরুণীদের প্রতি আবেগ উৎসারিত হলেও অন্য ধরনের আবেগের পরিচয়ও মেলে। ভাই চারাক্লুস -এর জন্য তিনি আবেগ-বিহ্বল হয়েছেন। চারাক্‌লুস মিশরে গিয়ে রাজনীতির পেছনে টাকা পয়সা উড়াচ্ছে। ভাইকে তিনি ভৎসনা করছেন, উপদেশ দিচ্ছেন। আবার এরপরেই দেবী আফ্রোদিতে ও জলপরী নর‍্যাইড এর[১৫] কাছে প্রার্থনা করছেন, ভাই যেন নিরাপদে দেশে ফিরে আসে।

বাৎসল্য রসের পরিচয় মেলে একটি কবিতায়। নিজের কন্যার কথা বলেছেন :

আমার এক সুন্দরী কন্যা
সোনালি ফুলের মতো —
আমার প্রিয় ক্লেয়িস;
তাকে জানি করব না ত্যাগ,
সমগ্র লিভিয়ার বিনিময়েও।

ফুল তাঁর কবিতায় অনেকখানি জুড়ে আছে। গোলাপ নিয়ে লেখা কবিতা কোনোদিন ভুলবার নয়। লিলি ফুল রাখালদের পায়ের তলায় বিনষ্ট হয়ে যায়, এতে তিনি বড় বেদনাবোধ করেন। তিনি দুঃখের সাথে স্মরণ করেছেন, কি করে মিষ্টি ফুলগুলো নর্তকীর পায়ের তলায় পিষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু তার বেদনা আনন্দে রূপান্তরিত হয়ে যখন তিনি শুনতে পান বসন্তের অগ্রদূত হিসেবে পাপিয়ার ডাক। কপোতের জন্য তাঁর অপরিসীম মমত্ববোধ। লোকে শুধু খেলার জন্য হত্যা করে - এ-কারণে তাঁর বড় দুঃখ। সুগভীর আবেগে তাঁর প্রেমের কবিতা ঋদ্ধ। একটি কবিতায় আছে :

> তিনি দেখছেন কিভাবে একটি মেয়ে এক লোকের পাশে বসে গুঞ্জন করছে আর মৃদু মৃদু হাসছে। এই দৃষ্টিপাত থেকে তাঁর মধ্যে এক দুর্দমনীয় কামনা জেগে উঠছে। তিনি বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছেন। তাঁর দেহের মধ্য দিয়ে যেন বিদ্যুৎ বয়ে যায়, কান শো-শো করতে থাকে, ঘাসের চাইতেও তাকে আরও মলিন দেখায়। এবং তিনি অনুভব করছেন যেন মৃত্যুর প্রান্তে এসে পৌঁছেছেন।

কবিতাটিতে প্রেমাবেগের সূক্ষ্ম বিকাশ ঘটেছে।

শুধু মানুষ নয়, প্রকৃতিও তাঁর কবিতায় বিস্তার লাভ করেছে। তিনি শুনতে পান পুষ্পভারাবনত বসন্তের পদধ্বনি। তাঁর কবিতায় আছে সূর্য, মধ্যরাতের চাঁদ, তারকা,

বিদ্যুতালোক, দ্বিপ্রহরের সমুদ্র, দীপ্ত আলোক, বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ। আলোকে আমরা উদ্ভাসিত হই। আবার সমুদ্রের কল্লোলে যেন আমাদের কানে অনুরণিত হতে থাকে — ঠিক বিটোফোনের সিম্‌ফনির মতো। তাঁর কবিতার মধ্যে সুইনবার্ন (Essays and Studies) লক্ষ করেছেন :

> The echo of that unimaginable song, with its pauses and redoubled notes, and retains falls of sound as of honey dropping from heaven, as of tears and fire and seed of life- which , but though run over and repeated in thought, pervades the spirit with a sweeting paney.

প্লেটো তাঁকে দশম *মিউজ*[১৬] বলে অভিহিত করেছেন। তিনি পনের প্রকার ছন্দে অনায়াসে লিখতে পারতেন। কবিতা এবং গীতিকবিতার মূলগত সৌন্দর্য নির্ভর করে শব্দ-প্রয়োগের ওপর। এতেও তাঁর অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় মেলে। এ সূত্রে জে. এ. সাইমন্‌ড (Studies of Greek poets) বলেছেন :

> of all the poets of the world, of all the illustrious artists of all literature, Sappho is the one whose every word has a peculiar and unmistakable perfume, a seal of absolute perfume and inimitable grace.

প্রবল আবেগ তাঁর কবিতার শিল্পরূপ ব্যাহত করেনি. শিল্পসৃষ্টিরূপে তাঁর কবিতা সার্থক হয়ে উঠেছে। তাঁর কবিতায় আছে সংগীতধর্মিতা। প্রাত্যহিক জীবন থেকে শব্দ চয়িত হলেও তা আশ্চর্য ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। ডায়োনিসাস তাঁর গীতিকবিতাকে মসৃণতা ও উজ্জ্বলতার নিদর্শন বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর কবিতায় আছে কোমলতা, মধুরতা, পেলবতা, সংগীতসুধা ও সৌন্দর্য। ডায়োনিসাস আরও বলেছেন, তাঁর কবিতায় আছে পানির স্বচ্ছতা আর ফুলের সৌরভ।

পাঁচ

প্রাচীনকালে আলেকজান্দ্রিয়া যখন গ্রীস সংস্কৃতিচর্চার একটি প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে তখন সেখানে তাঁর কবিতাবলির দশটি খণ্ডের কথা জানা যায়। অথচ বর্তমানকালে আমরা তাঁর কবিতা পেয়েছি খণ্ড খণ্ড রূপে, মাত্র একটি কবিতা সম্পূর্ণ আকারে। এর কারণ এই যে তাঁর কবিতার অগ্ন্যুৎসব হয় ১০৭০ খ্রিষ্টাব্দে রোম ও

কনস্‌টান্টিনেপোলে (বর্তমান ইস্তাম্বুলে)- সেকালের মাপকাঠিতে চরম নীতিহীনতার অভিযোগের দরুণ।

এরও আগে খোদ গ্রীস দেশে অনেকে এই মহিলা কবিকে দেখে অবাক হয়ে গেছে— Hetaira বা (উচুঁদরের) গণিকা না হয়েও প্রেমের কবিতা লিখেছেন কী করে। এরপর তিনি হয়ে ওঠেন রোমান্সের নায়িকা। তিনি একবার এক কবিতায় উল্লেখ করেন লিউকাডিয়া পর্বতশীর্ষ-এই পাহাড়ের চূড়া থেকে গাথার নায়কেরা লাফ দিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছে। আর তিনিও তাই করেছেন অচরিতার্থ বাসনা থেকে। এমন ধারণাই তাঁকে নিয়ে গড়ে ওঠে। এরপর *অ্যাটিক কমেডিতে* তাঁকে নিয়ে অনেক তামাশা করা হয়েছে — অনেক ব্যঙ্গবিদ্রূপ।

কিন্তু একটা কথা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতে হয়। তিনি মহিলা কবিরূপে অগ্রদূতীর ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর প্রভাবে গ্রীসের নানা স্থানে মহিলা কবির আবির্ভাব ঘটে। বোয়েটিয়ায় করিননা ও মাইট্রিস, আর্গসে টেলেমিল্লা, সিকিয়ন-এ প্রক্সিল্লা প্রমুখ। এমন কি, চতুর্থ শতকে ইরিন্না লিখতে গিয়ে তাঁকে কমরেড বলে অভিহিত করেছেন।

তাঁর প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ করা যায় রোমান কবিদের মধ্যে। কাটাল্‌লুস[১৭]; হোরেস্; ফরাসি কবিদের মধ্যে রোনসাড়[১৮], রাসেন[১৯], সেতুব্রাঁ[২০], লামারটিন[২১], বোদলেয়ার[২২]; ইংরেজ কবিদের মধ্যে ব্রাউনিং, টেনিসন, সুইনবার্ন; মার্কিনী কবিদের মধ্যে এডগার এলেন পো প্রমুখের মধ্যে মহিলা কবিরূপে আজও তিনি শ্রেষ্ঠ আসনে আসীন। ২৬০০ বছরের মধ্যে কেউ তাঁকে অতিক্রম করতে পারেনি।

ছয়

গ্রীসদেশে খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে গীতিকবিতার দুটি ধারা একতান ও একক এবং এই দুটি ধারাই সমান্তরাল প্রবাহিত হয়েছে। একক গীতিকবিতা রচনার ক্ষেত্রে স্যাফো বা আল-সেঅস সমবেত গীতিকবিদের মধ্যেও স্বীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিতে পেরেছেন এই সকল কারণে :

১. একক গীতে ব্যক্তিগত *মুড* প্রকাশ পায়। স্যাফো বা আল-সেঅস লিখেছেন নিজেদের জন্য, বন্ধুদের জন্য— কোনো বিশেষ উপলক্ষ বা প্রয়োজন ব্যতীত; সমবেত গীতিকবিদের মতো কোনো সাধারণ উৎসবের জন্য নয়। স্যাফো বা আল-সেঅসের কবিতা অন্তরের আবেগ ও তাগিদ থেকে রচিত। ফলে তাঁদের কবিতার আঙ্গিক সমবেত গীতের আঙ্গিক হতে স্বতন্ত্র।

২. তাঁরা লিখেছেন লেসবসের আঞ্চলিক ভাষায়। তাঁদের কবিতার ভাষা প্রাত্যহিক জীবনের ভাষার নিকটবর্তী — প্রাত্যহিক জীবন থেকে তাঁদের কবিতার ভাষা চয়িত ও নির্বাচিত। সুতরাং, এই ভাষার মধ্যে একটা স্বাভাবিকতা আছে। জোর করে এই ভাষা বলতে হচ্ছে না।

অপরপক্ষে একতান বা সমবেত গীত গ্রীসের জাতীয় ভাষায় রচিত। স্বভাবত এর মধ্যে একটা কৃত্রিমতা আছে।

৩. সমবেত গীত নৃত্য থেকে উদ্ভূত। অপরদিকে নৃত্য নয়, লোকগীতি থেকে একক গীতের উদ্ভব। ফলে এর ছন্দ অধিকতর সহজ এবং সংগীতধর্মী।

৪. যেহেতু কবি একাই একক গীত গেয়ে থাকেন, সেহেতু তা নির্দিষ্ট আয়তনে রচিত এবং আকৃতিতে সংক্ষিপ্ত হতে বাধ্য।

৫. সংক্ষিপ্ত আয়তনে বিষয় সুবিন্যস্ত হয়। একতান বা সমবেত গীতে তা হবার নয়।

সাত

গ্রীক একক গীতিকবিতার ক্ষেত্রে স্যাফোর অবদান কালে কালে নন্দিত হয়ে এসেছে। রোমান গীতিকবি কাটল্লুস-এর (৮৪-৫৪ খ্রি. পূ.) মধ্যে তাঁর বিশেষ প্রভাব লক্ষ করা যায়। রোমান সাহিত্যে কাটাল্লস একজন প্রথম শ্রেণীর গীতিকবি— আধুনিক সাহিত্যের শেলীর সমতুল্য। তিনি লেসবসবাসিনী স্যাফোর প্রভাবেই তাঁর প্রণয়িনী ক্লডিয়ার নামকরণ করেন লেসবিয়া। তাঁর মধ্যে স্যাফোর প্রভাব নির্ণয় করেছেন ডিমস্ডেল :

> The drawing of his passions he confessed in a translation (c. 51) of the ode in which Sappho depicted the divine exaltation, the overpowering taintness experienced by the lover in the presence of the beloved and it was probably with some reference to this initial poem that in the series by which it was followed Catullus gives Clodia the pseudonym of ``lady of Lesbos (Lesbia).

এরপর রোমান সাহিত্যে, ফরাসি সাহিত্যে, মার্কিনি সাহিত্যে, ইংরেজি সাহিত্যে তাঁর প্রভাব মেলে।

ইংরেজ' রোমান্টিক কবি বায়রন প্রাচীন গ্রীসের কথা স্মরণ করতে গিয়ে বিশেষভাবে তাঁকে স্মরণ করেছেন এবং উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছেন :

The isles of Greece ! The isles of Greece !
Where burning Sappho loved and sung.

তাঁর কবিতা আমাদের হৃদয়ে যুগ যুগ ধরে ভালোবাসার অনিবার্ণ শিখা জ্বালিয়ে রেখেছে যা কোনোদিন ভুলে যাবার নয়।

টীকা

১. *অলিম্পিয়াড*— গ্রীসের গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় খেলা অলিম্পিক প্রতি চার বছর অন্তর অনুষ্ঠিত হত। মাঝের এই সময়টুকুকে বলা হত অলিম্পিয়াড। প্রথম অলিম্পিয়াড শুরু হয় ২৭৬ খ্রি. পূ.।

২. বশ্বসাহিত্যে আল-সেঅস প্রথম কবি বা সাহিত্যিক, যাঁকে রাজনীতিক কারণে নির্বাসিত করা হয়।

৩. আধুনিক কালের সাহিত্যে সমালোচকের যে ভূমিকা প্রাচীনকালে বৈয়াকরণিকের ভূমিকা ছিল অনুরূপ। য়ুরোপ, গ্রীক, লাটিন এবং সংস্কৃত সাহিত্যে বৈয়াকরণিকেরা সাহিত্যের সূত্র নির্মাণ, ব্যাখ্যা -বিশ্লেষণ, তাৎপর্য নির্ণয় এবং রসনিষ্পত্তি করতেন।

৪. আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য বিভক্ত হয়ে মিশরের অধিপতি হন টলেমি সটার। রাজধানী হল আলেকজান্দ্রিয়া। টলেমি সটার গ্রীক পণ্ডিতদের রাজধানীতে আমন্ত্রণ জানান। আলেকজান্দ্রিয়ায় যে লাইব্রেরী গড়ে উঠল তার পুস্তক সংখ্যা দাঁড়ায় সাত লক্ষ। দীর্ঘকাল ধরে আলেকজান্দ্রিয়া গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল।

৫. ইপিকিউরিয়ান দর্শনের মূলকথা হল সুখ। সুখ লাভেই মানুষের সর্ববিধ প্রচেষ্টা নিয়োজিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা, মৃত্যুর পর মানুষের আত্মার বিনাশ ঘটে। সুতরাং ভবিষ্যৎ জীবনের প্রশ্ন অবান্তর। এ জীবনই মস্ত বড় আশীর্বাদ। এর ফলে মানুষ মৃত্যু-ভীতি এবং পরবর্তীকালের ভয় থেকে মুক্তি পেয়েছে। মৃত্যুভয় থেকে মুক্ত মানুষ এই ক্ষণকালীন জীবনে সুখে বাস করতে পারে।
ইপিকিউরিয়ান দর্শনের সাথে প্রাচীন ভারতবর্ষের চার্বাক দর্শনের আশ্চর্য সাদৃশ্য মেলে।

৬. হোরেস-এর জন্ম ৬৫ খ্রি. পূ. মৃত্যু ৮ খ্রিঃ পূঃ। তিনি একাধারে গীতিকবি, ব্যঙ্গকবি এবং সমালোচক।
তিনি একজন ছান্দসিক কবি ছিলেন। এবং পরবর্তীকালের রোমান ও য়ুরোপীয়, বিশেষতঃ ইংরেজি সাহিত্যে তাঁর বিপুল প্রভাব রয়েছে।

৭. গ্রীসদেশের আল-সেঅস এবং বাংলাদেশের নজরুল-এই দুই কবির মধ্যে একটি তুলনামূলক আলোচনা হওয়া আবশ্যক। কেননা :

ক. উভয়ে রাজনীতির সাথে জড়িত এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন।

খ. উভয়ে সরকার বিরোধিতা এবং পরিণামে কারাবরণ করেছে।

গ. উভয়ে যুদ্ধের অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ। দু'জনের কবিতায় যুদ্ধাস্ত্র বিশেষ স্থান লাভ করেছে। প্রাচীন কবির কবিতায় হ্যালমেট, বর্ম, ঢাল ইত্যাদি এবং আধুনিক কবির কবিতায় টর্পেডো, মাইন, সাবমেরিন, মেশিনগান, লুইস গান ইত্যাদি।

ঘ. আবার দু'জনের মধ্যে মানুষের কোমল আবেগের সার্থক রূপায়ণ ঘটেছে।

৮. যে অঞ্চলে এথেন্স নগরী বা নগররাষ্ট্র অবস্থিত সেই অঞ্চলটির নাম অ্যাংটিকা। তাই এথেন্সে রচিত কমেডিকে *অ্যাটিক কমেডি* বলেও অভিহিত করা হয়।

৯. ৪র্থ-৫ম খ্রিষ্টাব্দে গথ-ভিসিয়ানদের উপর্যুপরি আক্রমণে রোমান সাম্রাজ্যের পতনের ফলে গ্রীক পণ্ডিতেরা পুঁথিপত্র নিয়ে কনস্টান্টিনেপোলে (বর্তমান ইস্তাম্বুল) পালিয়ে আসেন। এরপর ইস্তাম্বুল হয়ে ওঠে আলেকজান্দ্রিয়ার মতো গ্রীক সংস্কৃতিচর্চার অন্যতম কেন্দ্র।

১০. সিগমুং ফ্রয়েড (১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়ায় জন্ম) লেসবসের স্যাফোর অনুসারে লেসবিয়ান তত্ত্ব ছাড়াও ইডিপাস কম্‌প্লেক্স, ইক্ট্রো কমপ্লেক্স এই সকল তত্ত্ব আবিষ্কার এবং স্বপ্নতত্ত্ব বা Psychoanalysis of dream প্রভৃতি তত্ত্ব নির্ণয় করেন।

১১. গ্রীসের রাষ্ট্রনেতা। ৫৯৪ খ্রিষ্ট পূর্বে তিনি এথেন্সের সার্কল নির্বাচিত হন। তাঁকে এথেন্সের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য অপরিসীম ক্ষমতা দেয়া হয়। তিনিই শাসনতন্ত্রের মাধ্যমে এথেনীয় গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন।

১২. গ্রন্থটির পুরো নাম *On the Grand Style, On Excellence and Literature.*

রেনেসাঁ ও নিউ ক্লাসিকাল লেখকগণ তাঁর *On the Sublime* গ্রন্থ দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছেন ; ইংরেজ কবিদের মধ্যে পোপ ও ড্রাইডেনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

১৩. গ্রীক ঐতিহাসিক (৪৮৪-৪২৫ খ্রি. পূ.)। তাঁকে ইতিহাসের জনক বলা যায়। তিনি পারস্য যুদ্ধের ইতিহাস রচনা করেছেন।

১৪. গ্রীক পুরাণে প্রেমের দেবী। রোমান নামকরণে এই দেবীর নাম হয় ভেনাস। ভারতীয় পুরাণে প্রেমের দেবী রতির সাথে তুলনীয়া।

১৫. গ্রীক পুরাণে জলপরী ; এরা সমুদ্রে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে বেড়ায়।

১৬. গ্রীকদের বাগ্‌দেবী। নয়জন বাগ্‌দেবী, স্যাফো দশম বাগ্‌দেবীর মর্যাদা পেয়েছেন।

১৭. কাটাল্‌লুস (৮৪-৫৪ খ্রি.) ; এই রোমান কবি স্যাফো দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছেন। তাঁর প্রেমিক ক্লদিয়াকে তিনি গীতিকবিতায় লেসবিয়া নামে সম্বোধন করেছেন। গীতিকবিরূপে ল্যাটিন সাহিত্যে তাঁকে হোরেস ও ভার্জিলের সমমর্যাদা দেয়া হয়। টেনিসন তাঁকে বলেছেন — Tenderest of Roman poets.

১৮. রোনসাড় (১৫২৪-৮৫) - এই ফরাসি কবি সবসময় রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছেন। তিনি নানা ধরনের কবিতা রচনা করলেও প্রেমের কবিতা রচনায় পারঙ্গমতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রেমের কবিতায় তাঁর ব্যক্তিগত আবেগ ও অভিজ্ঞতার প্রকাশ ঘটেছে।

১৯. রাসন (১৬৩৯-৯৯) - ফরাসি নাট্যকার। তাঁর নাটকগুলোর মধ্যে উল্লেখ্য *এড্রোম্যাকি* (১৬৬৭), *ফিড্রা* (১৬৭৭)। এগুলো গ্রীক কাহিনী অবলম্বনে রচিত। কোনো কোনো সমালোচক তাঁকে নাট্যকাররূপে সফোক্লিসের পরেই স্থান দিয়েছেন।

২০. সেতুব্রা (১৭৬৮-১৮৭৪) ; ফরাসি লেখক সেতুব্রাঁর রচনার বিষয় তিনটি — খ্রিষ্টধর্ম, প্রকৃতি এবং স্বয়ং। তাঁর রচনা ব্যক্তিগত হলেও এর মধ্যে যথেষ্ট মাধুর্য রয়েছে।

২১. লামারটিন (১৭৯০-১৮৬৯) ; এই ফরাসি কবি গীতিকবিতা রচনায় আশ্চর্য নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, ফরাসি দেশে গীতিকবিতাকে জনপ্রিয়

করে তুলেছেন। তাঁর এই ঐতিহাসিক ভূমিকার জন্যই প্রায় সমসাময়িক গতিয়ার মন্তব্য করেছেন :

Lamantine was not only a poet ; he was poetry itself.

২২. বোদলেয়ার (১৮২১-৬৭) - এই ফরাসি কবি কাব্যে প্রতীকী আন্দোলনের উদ্‌গতা। তিনি কবির কবি এবং তাঁর *অশুভের ফুল* কাব্যের মূল্য ঐতিহাসিক। পরিতাপের বিষয় এই *অশুভের ফুল* এর কবিতাগুলোর শিল্প-সৌন্দর্য সমসাময়িক পাঠক বড় একটা উপলব্ধি করতে পারেনি। বরং কয়েক যুগ ধরে কাব্যটি সাধারণ পাঠক এবং কোনো কোনো সমালোচকের নিকট লাম্পট্য, ব্যাধিগ্রস্তা ও অশ্লীলতার দ্যোতকরূপে পরিগণিত হয়েছে।